بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১০ এপ্রিল, ২০২৬ মোতাবেক ১০ শাহাদাত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

নিজ মনিবের অনুসরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তওহীদ (একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, তাঁর ব্যবহারিক আদর্শ আর নিজ অনুসারীদের প্রতি তাঁর উপদেশমালা এবং তিনি কীভাবে তাদের তরবিয়ত করতেন, সে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা আমি উপস্থাপন করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক ব্যক্তির ছেলে মারা গিয়েছিল। তার এক বন্ধু সমবেদনা জানাতে তার কাছে গেলে সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে এবং তাকে বলে, খোদা আমার প্রতি বড়ো অবিচার করেছেন। ভাবটা এমন যেন আল্লাহ্ তা'লা তার কোনো অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ভেবে দেখা উচিত, এমন কী অধিকার আছে যা বান্দা আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রাপ্য? আমার তো সবসময় এটি আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় যে, সেসব লোক, যারা নিজেদের নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং তাকওয়া ও পবিত্রতার জন্য অহংকার করে, তারা তো কোনো কষ্টের সময় চিৎকার করে ওঠে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অন্যায় করেছেন! কিন্তু ভারতের সেই মদ্যপায়ী কবি, যে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ দূরে ছিল, মদে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও সত্যসচেতনতার এক মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম তার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সে বলে ওঠে:

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

(প্রাণ দিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে এ প্রাণ তো তাঁরই দেওয়া;

সত্য কথা হলো, তাঁর কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয় নি।)

অতএব মানুষের সবসময় এই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যে-সব নিয়ামত ও যে-সব সন্তান-সন্ততি আমরা লাভ করেছি তা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ করেছি এবং এই বিষয়টির দাবি হলো, আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে বিনত থাকা, নিজেদের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর তওহীদের প্রকাশ ঘটানো। আমাদের মাঝে যেন শিরকের লেশমাত্রও না থাকে; আমরা যেন কখনো এটি মনে না করি যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর আমাদের কোনো অধিকার রয়েছে। সামান্য ইবাদত করার মাধ্যমেই কোনো হক বা অধিকার আদায় হয়ে যায় না, বরং নিজেদের কল্যাণার্থেই আমরা তা করে থাকি।

অতএব, যে কবির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সে তো এটাই বলে যে, জীবন আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন, এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি; কিন্তু তাঁর কৃতজ্ঞতার যে দায়িত্ব আমাদের পালন করা উচিত, তা পালন করার সাধ্য আমাদের নেই। একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের এক পুত্রের ইন্তেকালে তাঁর প্রতিক্রিয়ার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

মুবারক আহমদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মুবারক আহমদের প্রতি তাঁর (আ.) অগাধ ভালোবাসা ছিল এবং তার অসুস্থতার সময় তিনি (আ.)

অনেক সেবাযত্ন করেছেন। এর ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-রও ধারণা ছিল, যদি মুবারক আহমদ মারা যায় তবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খুবই আঘাত পাবেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে হযরত মৌলভী সাহেব (খলীফা আউয়াল) তার নাড়ি দেখছিলেন, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তিনি কস্তুরী আনতে বলেন। তার নাড়ি বন্ধ হয়ে আসছিল। তার মৃত্যুতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনেক কষ্ট হবে– এই চিন্তায় তাঁর [অর্থাৎ হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-র] ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, তিনি দাঁড়ানো অবস্থা থেকেই মাটিতে পড়ে যান। কিন্তু যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জানতে পারেন যে, মুবারক আহমদ মারা গেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বন্ধুদের কাছে পত্র লেখা আরম্ভ করেন যে, মুবারক আহমদ মারা গেছে, তবে এই বিষয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি ইচ্ছা ছিল, যেটিতে আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর এরপর বাইরে এসে হাসিমুখে তিনি (আ.) বক্তব্য রাখেন যে, মুবারক আহমদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার যে ইলহাম ছিল তা পূর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পঙ্‌ক্তিও রয়েছে:

بلانے والا ہے سب سے پیارا

اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر

(যিনি ফেরত নিয়েছেন তিনিই সবচেয়ে প্রিয়।

হে হৃদয়! তাঁরই জন্য তুমি প্রাণ উৎসর্গ করো।)

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে একটি কথা আমি বারবার শুনেছি। তিনি তুরস্কের ক্ষমতাচ্যুত বাদশা আবদুল হামিদ খানের কথা উল্লেখ করে বলতেন, সুলতান আবদুল হামিদ খানের একটি কথা আমার কাছে খুবই প্রিয়। যদিও তার অনেক কথাই ভুল ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) বলতেন যে, এই কথাটি আমার খুব পছন্দ। সেটা কী? তা হলো, যখন গ্রিসের সাথে যুদ্ধের প্রশ্ন আসে, তখন মন্ত্রীরা অনেক অজুহাত উপস্থাপন করে। আসলে সুলতান আবদুল হামিদ চাইতেন– যুদ্ধ হোক; কিন্তু মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল না, তাই তারা নানা অজুহাত উপস্থাপন করে। অবশেষে তারা বলে, যুদ্ধের জন্য এই জিনিসটিও প্রস্তুত এবং ওটাও প্রস্তুত, কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথা উল্লেখ করে বলে দেয়, অমুক বিষয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ, ঠিক আছে, আমরা প্রস্তুত; কিন্তু এই ঘাটতি রয়েছে এবং এই ঘাটতির কারণে যুদ্ধ করা অনেক কঠিন। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেছিল এবং সম্ভবত এটাই বলে থাকবে যে, সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি এই মুহূর্তে গ্রিসকে সাহায্য করার বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আর আমাদের কাছে কোনো প্রতিকার নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, যখন মন্ত্রীরা তাদের পরামর্শ দেয় আর সমস্যার কথা জানায় এবং বলে, অমুক জিনিসের ব্যবস্থা নেই, তখন সুলতান আবদুল হামিদ উত্তর দেন, কোনো কাজ তো খোদার জন্যও রেখে দেওয়া উচিত! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুলতান আবদুল হামিদের এই বাক্য খুবই উপভোগ করতেন এবং বলতেন, তার এই কথাটি আমার খুবই পছন্দনীয় যে, সে খোদার ওপর ভরসা করেছে।

তওহীদের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, কপুরথলা

নিবাসী মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমার কাছে লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাথা ঘোরার রোগ ছিল; মাথা ঘোরার কারণে কষ্ট হতো। এক চিকিৎসক সম্পর্কে জানা যায়, তিনি এতে বিশেষ দক্ষতা রাখেন। মাথা ঘোরা রোগের চিকিৎসায় তিনি খুব পারদর্শী, তাই তাকে ডাকা হয়। তাকে ভাড়া পাঠানো হয় এবং পথখরচ দিয়ে অনেক দূর থেকে ডাকা হয়। সে হুযূরকে দেখে বলে, এটি এমন কোনো ব্যাপারই না; দুই দিনের মধ্যে আমি আপনাকে সুস্থ করে দেবো। একথা শুনে হযরত সাহেব (আ.) অন্দরমহলে চলে যান এবং হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে এ মর্মে একটি চিরকুট লিখে পাঠান যে, এই ব্যক্তির কাছ থেকে আমি কখনোই চিকিৎসা করাতে চাই না। সে কি খোদা হবার দাবি করে? তার ভাড়ার অর্থ এবং অতিরিক্ত পঁচিশ রুপি পাঠিয়ে বলেন, তাকে এগুলো দিয়ে বিদায় করে দিন, আর তা-ই করা হয়।

একইভাবে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, খোদা তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখেন। এমন লোকেরা একটি সূক্ষ্ম পথে চলেন আর সবাই তাদের সাথে (তাল মিলিয়ে) চলতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার জন্য ভালোবাসার আবেগ-উচ্ছ্বাস না থাকবে, মানুষের কোনো আনন্দ লাভ হওয়া সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার জন্য ভালোবাসার ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাস না থাকবে এবং প্রবৃত্তির চাওয়া-পাওয়া ও নিজের পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধ্বে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত ও সদকা গৃহীত হয় না। *এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির কলুষ এবং জাগতিক লাভ-লোকসানের ধান্দা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো ইবাদত এবং সদকা গৃহীত হয় না।* যে ব্যক্তি খোদার জন্য ভালোবাসার আবেগ রাখে, সে (পুণ্যে) তার সমগোত্রীয়দের ছাড়িয়ে যায়; এমন লোকেরা খোদার নিকট থেকে কল্যাণরাজি লাভ করে।

অতএব, দোয়া গৃহীত হবার জন্য তওহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ঈমান থাকাও আবশ্যক। আর আল্লাহ্ তা'লার সমীপে তাঁর ভালোবাসা লাভের জন্য সর্বাগ্রে দোয়া করতে হবে। যারা লেখেন, 'আমরা অনেক দোয়া করেছি, আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি, নফল পড়েছি, সদকা দিয়েছি; কিন্তু আমাদের দোয়া গৃহীত হয় নি'– তাদের এ বিষয়টি একটু ভেবে দেখা উচিত। এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাতলে দিয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন,

খোদাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভালোবাসাকে এতটা মূল্যায়ন করেছেন, যা কেবল তাঁরই সীমাহীন দয়া এবং তাঁর অনন্য গুণগ্রাহীতার সাথে মানানসই বৈকি। যেমন, তাঁকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَفْرِيدِي، أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ وَلَدِي، إِنِّي مَعَكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ

অর্থাৎ, যেহেতু এ যুগে তুমি আমার তওহীদের পতাকাবাহী এবং পৃথিবীতে তওহীদের হারানো সম্পদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করছ, তাই হে মুহাম্মদী মসীহ্! তুমি আমার কাছে ততটাই প্রিয় যতটা আমার তওহীদ ও তাফরীদ (তথা আমার একত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য)। আর খ্রিষ্টানরা যেহেতু মিথ্যা এবং অপবাদমূলকভাবে তাদের মসীহ্কে খোদার দৈহিক পুত্র

বানিয়ে বসেছে, তাই আমার আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, আমি যেন তোমাকে সেভাবে ভালোবাসি যা সন্তানের প্রাপ্য হয়ে থাকে, যেন বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিষ্যও 'আতফালুল্লাহ্' (বা আল্লাহ্‌র সন্তানতুল্য) হবার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে। আর যেহেতু তুমি আমার প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মের সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন এবং তাঁর ভালোবাসায় বিভোর, তাই আমি তোমাকে আমার সেই প্রিয়ভাজনের আধ্যাত্মিক সন্তান হিসেবে আমার অমর ভালোবাসা এবং আমার চিরন্তন সাহচর্যের পদকে ভূষিত করছি।

এটি হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ উক্ত ইলহামের অর্থ, যা আমি এখনই পড়লাম। তাঁর জীবনচরিত সম্পর্কেই মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এক স্থানে লেখেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইসলামের সেবা এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠা। আর সেই যুগে খাঁটি তওহীদের সবচেয়ে বড়ো মোকাবিলা খ্রিষ্টধর্মের সাথেই ছিল; *আজও কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে*; যা তওহীদের ছদ্মাবরণে ভয়ানক শিরকের শিক্ষা দেয় এবং হযরত মসীহ্ নাসেরীকে *নাউযুবিল্লাহ্* খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে এক ও অদ্বিতীয় খোদার পাশে বসায়। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল জোশ বা উত্তেজনা ছিল আর এমনিতেও মসীহ্ হিসেবে পদাধিকার বলে বিভিন্ন হাদীসে তাঁর প্রধান দায়িত্বও 'কাসর-এ-সলীব' (তথা ক্রুশভঙ্গ) বলেই বর্ণিত হয়েছে। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃতুর ওপর অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। কারণ, শুধুমাত্র এই একটি বিষয় সাব্যস্ত হলেই খ্রিষ্টধর্মের কবর রচিত হয়। অর্থাৎ, ঈসার মৃত্যুর ফলে তাঁর ঈশ্বরত্বও টেকে না এবং ত্রিত্ববাদের নাম-চিহ্নও মিটে যায়, আর কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসও স্বীয় নড়বড়ে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। নিঃসন্দেহে মসীহ্ নাসেরীর মৃত্যুর বিশ্বাস স্বভাবতই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের সত্যতা প্রমাণের প্রথম সোপান; কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃত গুরুত্ব– যে কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি এত বেশি গুরুত্বারোপ করতেন– তা বর্তমান খ্রিষ্টধর্মের খণ্ডনের সাথে সম্পর্ক রাখে। *খণ্ডন শব্দটি হিন্দি, এর অর্থ হলো অপনোদন।* যেমন, তিনি প্রায়শই বলতেন, **তোমরা ঈসাকে মরতে দাও, কেননা এতেই ইসলামের জীবন নিহিত।** হায়! আমাদের অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা যদি এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করে কমপক্ষে খ্রিষ্টধর্মের মোকাবিলায় আমাদের সাথে একমত হতো! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি মানা বা না মানা ভিন্ন বিষয়; কিন্তু এটি তো অন্তত মেনে নিক, যা দ্বারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়। খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং এ যুগে সেসব বিশ্বাসের বিশ্বজুড়ে প্রসারের বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে এত ভারি বোঝা হিসেবে চেপে বসেছিল যে, তিনি এক স্থানে বেদনা ও মর্মযাতনায় জর্জরিত হয়ে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বলেন,

আমি সর্বক্ষণ এই চিন্তায় মগ্ন যে, কোনোভাবে আমাদের এবং খ্রিষ্টানদের মাঝে মীমাংসা হয়ে যাক। মৃতপূজার অনিষ্টে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এবং আমার প্রাণ অদ্ভুত এক কষ্টে জর্জরিত। এটি অপেক্ষা অধিক আর কোন মর্মযাতনা হওয়া সম্ভব যে, একজন অধম মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং সামান্য এক মুঠো ধুলোকে বিশ্বপ্রতিপালক জ্ঞান করা হয়েছে? যদি আমার প্রভু এবং আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে আশ্বস্ত না করতেন

যে, চূড়ান্ত বিজয় তওহীদেরই হবে– তাহলে আমি কবেই না এই বেদনায় ধ্বংস হয়ে যেতাম!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে অবগত এবং তিনি সকল বিষয়ে সর্বোত্তম সাক্ষী যে, তাঁর পথে আমাকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি দান করা হয়েছে, তা হলো 'কালবে সালীম' বা নিষ্কলুষ হৃদয়; অর্থাৎ এমন এক হৃদয়, যার সত্যিকার সম্পর্ক মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সাথেই ছিল না। আমি এক সময় যুবক ছিলাম এবং এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু আমার জীবনের কোনো কালেই মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদা ব্যতীত অন্য কারো সাথে আমার প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজে পাই নি। ভালোবাসার এই উষ্ণতার কারণেই আমি কখনো এমন কোনো ধর্মে সন্তুষ্ট হতে পারি নি, যার বিশ্বাস আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও একত্ববাদের পরিপন্থি অথবা যার অপরিহার্য ফলাফল হলো তাঁর অবমাননা। এ কারণেই খ্রিষ্টধর্ম আমার পছন্দ হয় নি, কেননা এর প্রতিটি ধাপে মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদার অবমাননা রয়েছে। একজন দুর্বল মানুষ, যে নিজেকেই সাহায্য করতে পারে নি, তাকেই খোদা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হযরত মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে পর পর দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। *তিনি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করেন তখন খোদার কৃপায় তারা জীবিত ছিল।* এরপর এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে, যে মূক ও বধির ছিল। প্রথম ছেলেটি প্রায় সময় অসুস্থ থাকত, কিন্তু দ্বিতীয় ছেলে বুদ্ধিমান ও সুস্থ ছিল। তার স্বভাব ও চেহারা-সুরত এতই মনোহর ছিল যে, ছোটো বয়সেই সে বাড়ির সব কাজকর্ম করত এবং সামান্য ইঙ্গিতেই কথা বুঝে যেত। সে খুবই বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। এসব কারণে তার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। প্রথম ছেলেটি চার বছর বয়সে মারা যায়। *অর্থাৎ যে ছেলেটি অসুস্থ ছিল, সে চার বছর বয়সে মারা যায়।* আর দ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছেলেটির বয়স যখন সাড়ে চার বছর হয়, তখন তার টাইফয়েড হয়। আমি অনেক চিকিৎসা করাই, কিন্তু আরোগ্যের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তার অসুস্থতার পনেরো দিন পার হলে সে **'সারসাম'** তথা মেনিনজাইটিসের ন্যায় রোগে আক্রান্ত হয়। *এতে মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে প্রদাহ দেখা দেয় বা ফুলে যায়; এটিকে সারসাম বলে।* আমি হযরত সাহেবের (আ.) সমীপে দোয়ার জন্য একটি পত্র লিখে জানাই, **সে আমার খুবই আদরের সন্তান। তার জন্য দোয়া করুন যেন সে বেঁচে যায়।** তিনি (আ.) এর উত্তরে লেখেন, **আমি দোয়া করব, ইনশাআল্লাহ্! কিন্তু যদি তকদীর-এ-মুবরাম (বা অমোঘ তকদীর) হয়ে থাকে, তবে তা টলতে পারে না।** এটি পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, এই শিশু বাঁচবে না। চতুর্থ দিন তার অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক ছিল এবং হুযূর (আ.) সেদিন গুরুদাসপুর মামলার শুনানিতে যাচ্ছিলেন। যেহেতু আমি প্রতিটি শুনানির দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যেতাম, তাই আমিও যাবার জন্য উপস্থিত হয়ে গেলাম। যখন তিনি (আ.) ঘর থেকে বের হন তখন প্রথমে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার সন্তান কেমন আছে? আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমার সাথে চলুন। গিয়ে দেখুন, অবস্থা খুব শোচনীয়! ঘর সাথেই ছিল। তিনি ঘরে এসে ছেলেকে দেখে বলেন, এ তো খুবই অসুস্থ! তুমি আজকে গুরুদাসপুর যেও না। *আজ তুমি আমাদের সাথে যেয়ো না।* তিনি নিজের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং পরদিন চারটার সময় বাচ্চা মারা গেল। এর পরদিন সকাল দশটায় হুযূর (আ.) গুরুদাসপুর থেকে ফেরত আসেন। আমি শুনতে পেয়ে করমর্দন করার জন্য অগ্রসর হলাম; আমার কোলে আমার ছোটো মেয়ে ছিল যে সেই পুত্রের চেয়ে ছোটো ছিল।

আমাকে দেখে হুযূর (আ.) বলেন, তোমার বাচ্চার মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছিল, তার সাথে তোমার ভালোবাসা শিরকের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল; এজন্য তার জীবিত থাকা প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। যাহোক, আমি তোমার সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেছি। আল্লাহ্ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম সন্তান দান করবেন, আর সে শ্রবণশক্তির অধিকারী হবে ও কথা বলবে। *(আল্লাহ্) নতুন সন্তান দেবেন যে শোনার ও বলার ক্ষমতা রাখবে, সুস্থ-সবল হবে।* তিনি বলেন, এরপর ফযল করীম জন্ম নিল, এরপর আব্দুল হাফিয জন্ম নিল, এরপর দুই ছেলে গর্ভপাতে নষ্ট হলো। যাহোক দুই সন্তান জীবিত জন্ম নিল। এরপর এক পুত্র জন্ম নিল, অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুল করীম জন্ম নিল। এরপর আহমদ জন্ম নিল। খোদার কৃপায় পাঁচজন সন্তান জীবিত জন্ম নিল। আল্লাহ্র কৃপায় সবাই জীবিত আর দীর্ঘায়ু পেয়েছে। মোটকথা, তিনি নিজ সাহাবীদেরও সর্বদা তওহীদের শিক্ষা দিতেন। এরপর তাদের মনস্তুষ্টির জন্য দোয়াও করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করে পাঁচজন পুত্র সন্তান দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা পৃথিবীর বিভিন্ন জনবসতিতে বসবাসকারী সব সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতে, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং তাঁর বান্দাদের একই ধর্মে সমবেত করতে চান। এটাই খোদা তা'লার অভিপ্রায়, যে উদ্দেশ্যে আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। অতএব তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ করো; কিন্তু কোমলতা, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমার সমূহ আনন্দ এতেই এবং আমার আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য এটিই যে, খোদা তা'লার তওহীদ এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক।

হযরত পীর ইফতেখার আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলেন, পীরাদিত্তা নামের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সেবক ছিল। আমরা সবাই তাকে এই নামেই ডাকতাম। কিন্তু হুযূর (আ.) যখন তাকে ডাকতেন পীরি দীত্তা বলতেন। পীরা দিত্তা নয় বরং পীরি দিত্তা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র দেওয়া আমার পীর। এটি সেই তওহীদ যেটি সম্পর্কে হুযূর (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **خذوا التوحيد التوحيد يا ابناء الفارس**

অর্থাৎ, হে পারস্য বংশোদ্ভূতরা! তওহীদকে আঁকড়ে ধরো, তওহীদকে আঁকড়ে ধরো। অতএব এই ইলহাম নিজ উন্নতির জন্য তাঁর বংশধর বরং প্রত্যেক মান্যকারীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, প্রত্যেক বয়আতকারীর সম্মুখে রাখা উচিত। তাঁর বয়আত করার পর সবাই তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। যদি একে অর্থাৎ একত্ববাদকে আঁকড়ে ধরে রাখে তাহলে দ্বীন ও দুনিয়া তথা পার্থিব ও আধ্যাত্মিক– উভয় ক্ষেত্রেই সম্মান লাভ করবে; নতুবা রক্তের সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না, কিংবা কেবল বয়আত করেও কোনো লাভ হবে না।

হাফেয মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রথমবার যখন আমি, হাকীম আব্দুল আযীয ও হাকীম আতা মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হই, সে সময় হুযূর (আ.) গুরুদাসপুরে অবস্থান করছিলেন; হুযূর ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন আমরা তিনজনই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি এবং হাকীম আব্দুল আযীয সাহেব হুযূরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে করমর্দন করি, কিন্তু ভাই আতা

মুহাম্মদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়েন। হুযূর তাকে হাত ধরে ওঠান এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই যুগে এই শিরককে দূর করার জন্যই তো প্রেরণ করেছেন। কদমবুসি করা শিরক। এরপর তিনি (আ.) তার সাথেও করমর্দন করেন।

অনুরূপভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশোয়ারী সাহেব পত্রযোগে আমাকে অবগত করেন যে, প্রাথমিক দিনগুলোতে আমি যখন কাদিয়ান যাই তখন এক ব্যক্তি তার ছেলেকে হযরত সাহেবের সামনে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠায়। যখন সেই ছেলে হযরত সাহেবের সাথে করমর্দন করার জন্য সামনে এগিয়ে আসে তখন সম্মান প্রদর্শনার্থে হুযূরের পায়ে হাত বুলাতে শুরু করে। এতে হুযূর (আ.) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা এরূপ করতে বাধা দেন এবং আমি লক্ষ করি, তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে; আর তিনি (আ.) অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, নবীরা পৃথিবীতে শিরক দূর করার জন্য আসেন এবং আমার কাজও শিরক দূর করা, শিরক প্রতিষ্ঠা করা নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি এই বিষয়ের কঠোর বিরোধী যে, কেউ আমার ছবি তুলবে। *ছবি সম্পর্কেও এখানে ব্যাখ্যা এসে যায়। অনেক মানুষ অপছন্দনীয়ভাবে নিজের, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এবং নিজ প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদেরও ছবি রেখে থাকে, এজন্য আমি এ বিষয়টি বর্ণনা করছি।* তিনি (আ.) বলেন, আমি এই বিষয়ের কঠোর বিরোধী যে, কেউ আমার ছবি তুলবে এবং এটিকে মূর্তিপূজারীদের ন্যায় নিজের কাছে রাখবে বা প্রচার করবে। আমি কখনো এরূপ করতে কাউকে নির্দেশ দিই নি। আর কেউ আমার চেয়ে বেশি মূর্তিপূজা ও ছবিপূজার শত্রু হবে না। কিন্তু আমি দেখেছি, আজকাল ইউরোপের লোকেরা যদি কোনো ব্যক্তির রচনা পড়তে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তারা তার ছবি দেখার আকাঙ্ক্ষী হয়। কেননা ইউরোপে মানুষ মুখাবয়ব বিচারবিদ্যায় (Science of Physiognomy) অনেক উন্নতি করেছে এবং তাদের অধিকাংশ কেবল ছবি দেখেই চিহ্নিত করতে পারে যে, এরূপ দাবিকারক সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। আর তারা হাজারো ক্রোশ দূরত্বের কারণে আমার কাছে আসতে পারে না আর আমার চেহারা দেখতে পারে না। তাই সে সকল দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ছবির মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এমন অনেক লোক আছে যারা ইউরোপ অথবা আমেরিকা থেকে আমার নিকট চিঠি লিখেছে, পত্র লিখেছে এবং তাদের চিঠিতে লিখেছে যে, আমরা আপনার ছবি গভীরভাবে দেখেছি এবং **'ইলমে ফিরাসাত'** বা মুখাবয়ব বিচারবিদ্যা (Science of Physiognomy) আমরা মানতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি যার ছবি সে মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যাবাদী হতে পারে না। একজন আমেরিকান নারী আমার ছবি দেখে বলে, এটি যীশু অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর ছবি। অতএব, এই উদ্দেশ্যে এবং এই সীমা পর্যন্তই আমি এই রীতি অবলম্বনের বিষয়ে নীরব ছিলাম। এজন্য আমি ছবি তোলার অনুমতি প্রদান করেছি; কিন্তু যদি শিরকের বিস্তার ঘটে তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। **ওয়া ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত** (অর্থাৎ কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল)। আর আমার বিশ্বাস এটি নয় যে, ছবি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; আমি এটিও বলছি না যে, ছবি ওঠানো হারাম কাজ। কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, জিন জাতি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য ছবি বানাত এবং বনী ইসরাঈলের নিকট দীর্ঘকাল ধরে নবীদের ছবি ছিল। বনী ইসরাঈলের

কাছে নবীদের যে-সকল ছবি ছিল সেগুলোর মাঝে মহানবী (সা.)-এর ছবিও ছিল। জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে একটি রেশমি কাপড়ে হযরত আয়েশা (রা.)-র ছবি দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও জলাশয়ে কতক পাথরের ওপর প্রাণীদের চিত্র প্রাকৃতিকভাবে খোদিত হয়ে যায়। ভূমিকম্পের কারণে পাহাড়ে বিভিন্ন প্রাণী চাপা পড়লে সেগুলোর ছবি চিত্রিত হয়ে যায়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে বর্তমানে ছবি তোলা হয়, অর্থাৎ ক্যামেরা, তা মহানবী (সা.)-এর যুগে আবিষ্কৃত হয় নি। আর এটি খুবই আবশ্যকীয় যন্ত্র যার মাধ্যমে কতক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। *অতএব শুধুমাত্র ছবির বিষয় নয়; বরং তিনি (আ.) বলেন, এর মাধ্যমে রোগসমূহ নির্ণয় করাও সম্ভব হয়। বর্তমানে এই প্রযুক্তি আরও উন্নতি সাধন করেছে। সেই যুগে এক্স-রে ছিল।* তিনি (আ.) বলেন, ছবি তোলার জন্য আরও একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার মাধ্যমে মানুষের সমস্ত হাড়ের ছবি তোলা হয়, *অর্থাৎ এক্স-রের মাধ্যমে*। অস্থিসন্ধির ব্যথা ও গেঁটেবাত প্রভৃতি রোগ নির্ণয়ে এই যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি তোলা হয় এবং রোগের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। *এখন তো স্ক্যানিং, এমআরআই প্রভৃতি অনেক কিছু হয়ে থাকে। সেই যুগে এই যন্ত্রসমূহের যতটুকু ব্যবহার ছিল তিনি (আ.) তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, এটি খুবই উপকারী যন্ত্র; তাই একথা বলা যে, এর সামনে মোটেও যাবে না– এটি ভুল। উদ্দেশ্য ভালো হওয়া উচিত।* ***ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত।*** *এরূপ হলে ঠিক আছে, এটি বৈধ। শিরক হওয়া উচিত নয়।* তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে ছবির মাধ্যমে জ্ঞানের অনেক কল্যাণকর দিক উন্মোচিত হয়েছে। *সাধারণ স্থিরচিত্রের মাধ্যমেও অনেক কল্যাণকর দিক উন্মোচিত হয়েছে।* কতিপয় ইংরেজ পৃথিবীর সকল প্রাণীর, এমনকি বিভিন্ন প্রকার পঙ্গপালের ছবি এবং নানান প্রকার পশুপাখির ছবি নিজেদের পুস্তকে ছাপিয়েছে। *বর্তমানে বিভিন্ন চ্যানেলেও রয়েছে, যেমন National Geographic বা এমন আরও চ্যানেল আছে, এরা তো ছবি তুলে প্রাণিকুলের বিস্তারিত বিবরণও উপস্থাপন করে থাকে। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন,* এর মাধ্যমে জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছে। অতএব, এটি কি ধারণা করা যেতে পারে যে, সেই খোদা– যিনি জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন– তিনি এমন যন্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করবেন, যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো জটিল রোগসমূহ নির্ণিত হয় এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের সঠিক পথপ্রাপ্তির একটি মাধ্যম হয়? এগুলো সব অজ্ঞতা যা প্রসার লাভ করেছে। *ছবিকে হারাম বলা, নিষিদ্ধ বলা এটিও ভুল। তবে, হ্যাঁ, উদ্দেশ্য ভালো হতে হবে।* তিনি (আ.) বলেন, আমাদের দেশের মৌলভীরা বাদশার চেহারা খচিত টাকা, দুই আনা, চার আনা এবং আট আনা নিজের পকেট থেকে আর ঘর থেকে কেন বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না? এই মৌলভীরা যদি এতটাই চরমপন্থি হয়, তবে আমাদের যে-সব কয়েন তথা পয়সা, টাকার নোট আছে– যেগুলোর ওপর বাদশাহদের ছবি অঙ্কিত থাকে– তারা সেগুলো কেন ঘর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না? কেন নিজেদের পকেটে বহন করে বেড়ায়? এই পয়সাগুলোর ওপরে কি ছবি নেই? পরিতাপ! এই লোকেরা অন্যায়ভাবে অযৌক্তিক কথা বলে বিরোধীদেরকে ইসলাম নিয়ে হাসিঠাট্টা করার সুযোগ করে দেয়। ইসলাম সকল অনর্থক কাজ এবং এমন কাজ যা শিরক বা পৌত্তলিকতাকে সমর্থন করে তা হারাম করেছে; এমন কাজকে নয় যা মানুষের জ্ঞানের প্রসার করে এবং রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয় ও বিচক্ষণ লোকদের হিদায়াতের নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি ঘুণাক্ষরেও এটি পছন্দ করি না যে, আমার জামা'তের সদস্যরা– এমন কোনো প্রয়োজন ব্যতীত যা তাদেরকে

বাধ্য করে– আমার ছবি ঢালাওভাবে প্রকাশ করাকে নিজেদের উপার্জনের মাধ্যম এবং পেশা বানিয়ে নেবে। পুণ্যময় উদ্দেশ্য হলে ঠিক আছে। ছবি (ছাপানো) উপার্জনের মাধ্যম বানিও না। কেননা এভাবে ধীরে ধীরে বিদআত সৃষ্টি হয় এবং (পরিশেষে) বিষয়টি শিরক পর্যন্ত গড়ায়। তাই আমি আমার জামা'তকে এ স্থানেও উপদেশ দিচ্ছি, যতটুকু তাদের পক্ষে সম্ভব এমন কাজ থেকে যেন বিরত থাকে। অনেক ব্যক্তির কাছে আমি এমন কার্ডও দেখেছি যার পেছন দিকে এক পাশে আমার ছবি রয়েছে। আমি এমন ধরনের ছাপার ঘোর বিরোধী আর আমার জামা'তের কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করুক– আমি তা চাই না। কোনো সঠিক এবং উপকারী বা কল্যাণকর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা এক বিষয়, আর হিন্দুদের মতো যারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ছবি যত্রতত্র ঘরদোরে ঝুলিয়ে রাখে– তা ভিন্ন বিষয়। সর্বদা এটিই পরিলক্ষিত হয় যে, এমন অনর্থক কাজ শিরকে পর্যবসিত হয়ে থাকে এবং সেগুলো থেকে বড়ো বড়ো অনিষ্ট দেখা দেয়, যেভাবে হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি আশা রাখি, যে ব্যক্তি আমার উপদেশমালাকে গুরুত্ব ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে আর আমার প্রকৃত অনুসারী, সে এই নির্দেশের পর এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। নতুবা সে আমার নির্দেশনার বিপরীতে নিজেকে পরিচালিত করে এবং শরীয়ত নির্ধারিত পথে অসম্মানজনকভাবে পদচারণা করে।

অতএব অনেক গুরুত্বের সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে, আমাদের ছবি টাঙানোর উদ্দেশ্য কী? কোনোভাবেই এই উদ্দেশ্যে যেন শিরকে পর্যবসিত না হয়। ছবি বা প্রতিকৃতিসমূহকে সালাম করা এবং সেগুলোর সম্মুখে অবনত হওয়া সব শিরকপ্রসূত ধ্যানধারণা। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই এমনটি করে থাকে, অর্থাৎ তারা তাদের প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের পুরোনো কোনো ছবি টাঙিয়ে দেয় এবং সেই ছবির উপর ফুলের মালাও চড়িয়ে দেয়। এখানে আমাদের ভেতরেও এখন কোনো কোনো জায়গায় এমন রীতি হয়ে গেছে যে, তারা তাদের মৃত জ্যেষ্ঠদের ছবি বানিয়ে নিজেদের গ্রুপ ছবির সাথে একটি বড়ো ফ্রেমে একসাথে বাঁধিয়ে রাখে আর বলে, এই হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষদের ছবি যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তারাও আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন। এ সবই হচ্ছে শিরক। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো ভ্রান্ত বিষয় এবং বিদআত, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। অনেক সময় আমার কাছে রিপোর্ট আসে যে, অনেকে নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবিও এভাবে উঠিয়ে থাকেন। শুধুমাত্র ভালো উদ্দেশ্যে অথবা নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজেদের ছবির অ্যালবামে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যদি ছবি উঠিয়ে থাকেন তাহলে সেটি বৈধ, কিন্তু এটিকে একটি বিদআত বানিয়ে ফেলা এবং সেই ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে সেটিকে দেখা এবং সকালে উঠে সেটিকে সালাম করা– এগুলো ভ্রান্ত কাজ, যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

হযরত সূফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের কতক ব্যক্তি এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল যে, আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে দাবিকারক ব্যক্তির ছবি দেখতে চাই, এজন্যই হুযূরের ছবি তোলা হয়েছিল। এখানে আব্দুল মুহী নামের এক আরব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হুযূরের ছবি সম্বলিত অনেকগুলো কার্ড ছাপান। হুযূর (আ.) যখন জানতে পারেন যে, কার্ডসমূহে অর্থাৎ পোষ্টকার্ডে (তাঁর) ছবি ছাপানো হয়েছে, তখন হুযূর খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিজের ছবি তুলেছিলাম; আমি এটি মোটেই পছন্দ করি না যে, আমার ছবিকে উপার্জনের মাধ্যম

বানানো হবে যা শিরকে পর্যবসিত হতে পারে। অতএব এরপর সেই কার্ডগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে লিখি, আমি এই ধরনের ওযীফা পড়ে থাকি; আর এটিও নিবেদন করি যে, বয়আতের পর থেকে আমার মনে এই ধারণা আসে, যেখানে সাধারণ পীরদের মুরিদরা তাদের পীরদের চিত্র মাথায় রেখে ধ্যান করে সেখানে আমার নেতা ও মুর্শিদ– যিনি খোদার প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী– তাঁর চিত্র আমি কেন আমার হৃদয়ে ধারণ করব না? অর্থাৎ আমার নিজ হৃদয়ে তাঁর চিত্র ধারণ করে, প্রতিচ্ছবি স্মরণ করে নিজের সকল লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করব। আপনার অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চিত্র হৃদয়ে ধারণ করা সেই সকল পীরের চিত্র ধারণ করার চেয়ে বেশি বরকতমণ্ডিত, উপকারী এবং যথোপযুক্ত হবে।

তিনি (রা.) বলেন, আপনি তো প্রতিশ্রুত মসীহ্; অন্যান্য পীর-ফকিরদের ধারণা করা বৈধ হবে কি না– জানি না। মানুষ যেহেতু তাদের ধ্যান বা কল্পনা নিয়ে পড়ে থাকে, তাই আমি কেন সারাক্ষণ হৃদয়ে আপনারই কল্পনা নিয়ে চলব না? রাজেকী সাহেব বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে এটি লেখার পর হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের হাতে লেখা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পত্র হস্তগত হয়। তাতে লেখা ছিল, **সৃষ্টির কল্পনা বা ধ্যান শিরক ছাড়া আর কোনো ফলাফল বয়ে আনে না। তোমরা যে কল্পনা করো, তা থেকে শিরক ছাড়া আর কিছুই জন্ম নেবে না। আল্লাহ্ তা'লার যিকরের জন্য আল্লাহ্‌র নামই যথেষ্ট। আর দরূদ শরীফ সেটিই পড়া উচিত যার ওপর মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের সত্যায়ন রয়েছে।** এই চিঠি পাবার পর আমি সেই মুহূর্তেই সেই ধারণা পরিত্যাগ করি এবং পূর্বের যিকর-আযকারের রীতিনীতি পুরোপুরি ছেড়ে দিই।

হযরত মাস্টার সৈয়্যদ নযীর আহমদ সাহেব বলেন, মুহাজির কাদিয়ান মরহুম সৈয়্যদ ফযল শাহ সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, একবার এক বন্ধু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আলকেমি (তথা সস্তা ধাতু থেকে স্বর্ণ বানানো) সম্পর্কে জানতে চান। হুযূর (আ.) বলেন, আলকেমিস্টরা রিযকের সন্ধানে এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা সেই সঠিক উপায়গুলো কাজে লাগায় না যা আল্লাহ্ তা'লা বৈধভাবে রিযক লাভের জন্য নির্ধারণ করেছেন। রসায়নবিদরা খোদা-নির্ভরতার মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় না, তাই তারা সঠিক ও বৈধ পথ ছেড়ে নিজেরাই একটি পথ বানিয়ে নেয় এবং জানে না যে, খোদা বলেছেন–

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ (সূরা আয-যারিয়াত: ২৩)

(অর্থাৎ 'আকাশেই রয়েছে তোমাদের রিযক এবং যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।') আমরা তো এমন অপয়াদের সবচেয়ে বড়ো মুশরিক মনে করি। খোদা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে মু'মিনকে একটি পরশপাথর পাবার উপায় বলে দিয়েছেন, যার ওপর আমল করলে আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে রিযক দান করেন, যেমনটি তিনি ওয়াদা করেছেন। কিন্তু তা কেবল তাদেরকেই দেন যারা তাঁর দিকে ঝোঁকে। মু'মিনকে একটি আলকেমির সূত্র শেখান, যা পালন করলে মানুষ প্রকৃত অর্থে আলকেমিস্ট হয়ে যায় এবং খোদা তার প্রতিটি প্রয়োজন নিজেই পূরণ করে থাকেন। যেমন খোদা বলেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (আত-তালাক: ৩-৪)

(আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার জন্য বিপন্মুক্তির কোনো না কোনো পথ বের করে দেন। আর তিনি তাকে এমন স্থান থেকে রিযক দেন, যার ধারণাও সে করতে পারে না।) লক্ষ করো! যেখানে মুত্তাকীকে উভয় জাহানের নিয়ামত দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সে আর কার মুখাপেক্ষী হতে পারে? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দেন এবং এমন স্থান থেকে রিযক দেন যে, তাদের ধারণাও থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, সমস্ত জগতের নিয়ামত যেহেতু দেওয়া হয়, তাই একজন মুত্তাকী আর কার মুখাপেক্ষী হতে পারে? আমি তো বলি, আলকেমিস্টরা তাদের যে সময়টুকু আলকেমির পেছনে নষ্ট করে; তারা যদি তাদের স্রষ্টার জন্য সেই সময়টুকু ব্যয় করত, তবে তারা নিজেদের মনের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারত। শর্ত হলো, তাদেরকে সঠিকভাবে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

পুণ্যবান মানুষের ওপর তাঁর তওহীদ সংক্রান্ত লেখা এবং এজন্য তাঁর যে আমল ছিল সেটির প্রভাব কেমন হতো– সে সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একজন নিষ্ঠাবান বুযুর্গের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীরের বারামুল্লার রেঞ্জ অফিসার মীর আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে লিখে জানান, আমার বাবা আগে হানাফী ছিলেন, পরে আহলে হাদীস হন। সে সময় তিনি তার বন্ধু আসনূরের মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সাহেবকে বলতেন, আমরা এখন বড়ো একত্ববাদী হবার দাবি করি; তবে হতে পারে এমন কোনো দল আসবে যারা আমাদেরও মুশরিক গণ্য করবে। বাবা বলতেন, শেষ পর্যন্ত তেমনটিই হলো। কারণ আমরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃতদের জীবনদাতা এবং পাখিকূলের সৃষ্টিকর্তা মনে করতাম। কিন্তু যখন আমার কানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কবিতাটি পৌঁছাল–

সে নাকি অধিকাংশ পাখির স্রষ্টা?
খোদাতে তোমার এমন বিশ্বাসের জন্য বাহবা!
মৌলভী সাহেব! এটিই কি তওহীদ?
সত্য করে বলো, এটি কোন দেবতার অনুসরণ করছ?

তখন আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম এবং আমি তোমাদের দুই ভাইকে শ্রীনগরে আপন মামার কাছে রেখে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান চলে গেলাম। আর সেখানে গিয়ে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলাম। এ বিষয়টিই আমাকে তবলীগ করেছিল।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রা.) বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৯০১ সালের কথা। একবার আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মহান আল্লাহ্‌র তওহীদ সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। আর তাতে তিনি বলেন, কিছু মানুষ কেউ অনুগ্রহ করলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার) না বলে সরাসরি 'জাযাকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দিন) বলে দেয়। বাহ্যত এটি সঠিক মনে হলেও সূক্ষ্ম বিচারের নিরিখে এ শব্দটি একপ্রকার শিরকের দিক নিজের মাঝে অন্তর্নিহিত রাখে। কারণ অনুগ্রহকারীর সত্তা এবং যে জিনিসের মাধ্যমে সে অনুগ্রহকারী সাব্যস্ত হয়েছে– উভয়টিই সত্যিকারার্থে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্ট জিনিস। তাই অনুগৃহীত ব্যক্তির উচিত হলো 'জাযাকাল্লাহ্' বলার আগে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা এবং অনুগ্রহ লাভের পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলা। কেননা সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের নিরিখে আবশ্যক হলো, প্রথমে উপায়-উপকরণের স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা আদায় করা, তারপর সেই ব্যক্তিকেও 'জাযাকাল্লাহ্' বলে দেওয়া।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লাহোরের শেষ সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী লেখেন, বেলা গড়ানোর সাথে সাথে ব্যবস্থাপকগণ দাওয়াতের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং একে একে সম্মানিত অতিথি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাহন আসতে শুরু করল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেখানে বক্তব্য রাখার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা তখনও অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন ছিল। শারীরিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, এমতাবস্থায় হুযূরের পক্ষে ভাষণ দেওয়া সম্ভব হবে বলে বিন্দুমাত্র আশা ছিল না। এই চিন্তা থেকেই হুযূর (আ.) হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-র কাছে নির্দেশ পাঠান যে, আপনিই আগত মেহমানদের আধ্যাত্মিক খোরাকের (তথা ভাষণের) ব্যবস্থা করুন। তদনুসারে নির্ধারিত সময়ে হযরত মৌলভী সাহেব ভাষণ শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সেই উজ্জ্বল চন্দ্র ও দীপ্ত সূর্য সশরীরে আমাদের মাঝে উদিত হন। *অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন।* হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব ভাষণ বন্ধ করেন আর হুযূর (আ.) দাঁড়িয়ে উপস্থিত সুধীকে সম্বোধন করে প্রায় তিন ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত জোরালো, তথ্যবহুল ও তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন; *কোথায় সেই অসুস্থতা– যার কারণে উঠে দাঁড়ানোই কঠিন ছিল! কিন্তু যখন এলেন তখন* তিন ঘণ্টা যাবৎ অত্যন্ত জোরালো, তথ্যবহুল ও তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ এমন বক্তব্য রাখেন যে, এতে আপনজনেরা তো বটেই, বহিরাগতরাও ছিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর তারা এমন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনতে থাকে আর এই আধ্যাত্মিক ভোজের স্বাদ তারা এমনভাবে অনুভব করছিল যা তাদের জাগতিক খাবারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন করে রেখেছিল। হুযূরের ভাষণে এমন সাবলীলতা ছিল যে, তা নোট করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। আর বক্তব্যেও এমন প্রতাপ ও গাম্ভীর্য বিরাজমান ছিল যে, ভরা মজলিসে কারো নিশ্বাসের শব্দও অনুভূত হচ্ছিল না। হুযূর এতটাই আবেগ ও উদ্দীপনার সাথে ভাষণ দিচ্ছিলেন যে, বক্তব্যের প্রভাবে নিজেও শ্রোতাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং ভালোভাবে লক্ষ করেছি, হুযূর কয়েকবার মঞ্চের টেবিল থেকে কয়েক কদম সামনে এগিয়ে যান। হুযূর টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, বরং টেবিলটি হুযূরের পেছনে ছিল। *অর্থাৎ (স্টেজে) যে টেবিল দেওয়া হয়েছিল তিনি (আ.) এর পেছনে না দাঁড়িয়ে বরং সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। এজন্য বক্তৃতার সময় উচ্ছ্বাসে কখনো কখনো দু-এক পা সামনেও চলে যেতেন।* হুযূর (এই) বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর সর্বোচ্চ দশ দিন আগে ডাক্তার সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেবের বাড়ির উঠানে প্রদান করেন; *বড়জোর দশ দিন পূর্বে এই বক্তৃতা প্রদান করে থাকবেন;* যেটিকে 'তকমীলে তবলীগ' ও 'ইতমামে হুজ্জত' নামে অভিহিত করা হতো, আর ইতঃপূর্বে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের বাড়ির ছাদে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা হয়েছিল। *অর্থাৎ তা একটি বড়ো ধরনের তবলীগি সফর ছিল।* এসব বক্তৃতা ছাড়াও হুযূর ছোটো-বড়ো আরও অনেক বক্তব্য প্রদান করেন।

তিনি আরও লেখেন, সেই সময় 'পয়গামে সুলেহ' পুস্তক রচনাকালে হুযূর যখন ডাক্তার সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন তখন হিন্দু নারীদের একটি প্রতিনিধি দল হুযূরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দ্যেশে উপস্থিত হয়েছিল। হুযূর যেহেতু অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন (তাই) তাদেরকে দ্রুত বিদায় জানাতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তারা নাছোড়বান্দা ছিল আর এমনভাবে কোনো না কোনো উপদেশ প্রদানের জন্য আবেদন জানায় যে, হুযূর (আ.) সীমাহীন ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তাদের আবদেনকে গ্রহণ করে

তওহীদের অনুসরণ করতে উপদেশ প্রদান করেন এবং মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন। খোদার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা করার প্রতি উপদেশ প্রদান করেন। এই ঘটনাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ দুই-একদিনের ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে সেই নারী প্রতিধিদল দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে এবং হুযূর (আ.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে চাচ্ছিল, কিন্তু হুযূর (আ.)-এর ভীষণ ব্যস্ততার কারণে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত চলে গেছেন। অনুরূপভাবে হুযূর (আ.)-এর আরেকটি ভাষণ কতিপয় বাক্যাংশের জন্য, অধিকন্তু সর্বশেষ ভাষণ হবার কারণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ আর খাদেমদের মুখেমুখে আলোচিত, যার মাঝে হুযূর (আ.) বলেছিলেন, **ঈসা মসীহ্কে মরতে দাও কারণ এতেই ইসলামের জীবন নিহিত; মুহাম্মদী মসীহ্কে আর্বিভূত হতে দাও, কারণ এর মাঝেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে**। এগুলো ছিল তাঁর (আ.) একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুলতা; অসুস্থতা ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইসলামের বার্তা এবং একত্ববাদের বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। অতএব বর্তমানে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর দাসদের দায়িত্ব হলো এই তওহীদের বার্তা পৌঁছানো এবং একে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার জন্য পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য দান করুন।

পৃথিবীর (বর্তমান) অবস্থা, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে সবাই অবগত আছেন যে, কী ঘটছে! অনেক বেশি দোয়া করা প্রয়োজন। যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা বেশি দিন টিকবে বলে মনে হচ্ছে না। বস্তুত এতে ইতোমধ্যেই ফাটল ধরতে শুরু করেছে। ইসরাঈলী সরকার যেভাবে হোক লেবাননের ওপর আক্রমণ করে ইরানীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে যেন তারা পালটা আক্রমণ করে। এখন তো ইউরোপের কতিপয় নেতাও তাদের (তথা ইসরাঈলের) এসব কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছে। যাক, অন্তত একবার হলেও তো তারা সরব হয়েছে! কিছুটা হলেও তো নৈতিকতা প্রদর্শন করল এরা! কিন্তু তারা এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; তাদের নৈতিকতার দৌড় এতটুকুই! এর বেশি তারা চেষ্টাও করতে চায় না, কিংবা এর চেয়ে বেশি সৎসাহস বা শক্তিও তাদের নেই। যাহোক, আমাদের এই দোয়াই করতে হবে– আল্লাহ্ তা'লা যেন মুসলিম বিশ্বের প্রতি কৃপা করেন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)